লকডাউনে আইসিইউতে বেসরকারি হাসপাতাল

রোগী ভর্তি কমে ১৮-২০% ■ আয় কমেছে ৭০-৯০%

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আর পাঁচটা শিল্পক্ষেত্রের মতো নভেল করোনাভাইরাস থাবা বসিয়েছে রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে। লকডাউনের কারণে হাসপাতালগুলি বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে। কেন্দ্রের কাছে ত্রাণ প্যাকেজ চেয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা মেনে হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র আপৎকালীন অস্ত্রোপচার এবং পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। কিছু হাসপাতাল তাদের ওপিডি পরিষেবা শুরু করলেও রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলির আয় প্রায় ৭০-৯০ শতাংশ কমে গিয়েছে। পাল্লা দিয়ে পরিচালন খরচ বেড়েছে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ।

রাজ্যের, বিশেষ করে, কলকাতার হাসপাতালগুলির একটা বড় আয় আসে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং মায়ানমার থেকে আসা রোগীদের চিকিৎসা থেকে। সেই রোগীদের আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মেডিকা সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান তথা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির হেলথ কমিটির মেন্টর ডক্টর অলোক রায় বলেন, 'বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই খারাপ আর্থিক অবস্থায়। আমাদের হাসপাতালে মোট শয্যার মাত্র ১৫ শতাংশে ভর্তি। আয় ৮০-৯০ শতাংশ কমে গিয়েছে। অথচ, পিপিই সমেত চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে।'

তাঁর আশঙ্কা, 'পরিস্থিতি এমন জায়গায় যাচ্ছে যে সামনের মাস থেকে বেসরকারি হাসপাতালগুলি কর্মীদের বেতন দিতে পারবে কি না সন্দেহ। বিষয়টি নিয়ে বহুবার কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আর্থিক প্যাকেজের আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু, আলোচনার বাইরে কিছুই এগোয়নি। এই রকম পরিস্থিতি চললে আগামী এক-দু'মাস পর বেসরকারি হাসপাতালগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

শুধু কলকাতায় নয়। রাজ্যের অন্য শহরগুলিতেও একই ছবি। দুর্গাপুরের

মিশন হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডক্টর সত্যজিৎ বসু বলেন, 'বর্তমানে হাসপাতালের প্রায় ৪০০ শয্যার মাত্র ৩০ শতাংশে ভর্তি। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে জটিল এবং আপৎকালীন অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে না। যানবাহন না থাকায় খুব সমস্যা না হলে রোগীরা হাসপাতালে আসছেন না। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালের আয় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে। বিমা সংস্থা এবং কর্পোরেট গ্রাহকদের কাছ থেকে বকেয়া ৫৮ কোটি টাকাও পাওয়া যাচ্ছে না।' তবে, যানবাহন স্বাভাবিক হলে হাসপাতাল ফের ভর্তি হয়ে যাবে বলেই আশাবাদী তিনি।

কলকাতার নামজাদা অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হাসপাতালের এক কর্তা নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, 'আমাদের মোট রোগীর ২৫-৩০ শতাংশে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার থেকে আসে। ওপিডিতে ডাক্তার দেখানো এবং তারপর বিভিন্ন টেস্ট বাবদ ওখান থেকে একটা বড় আয় হয়। সেটা এখন একবারেই বন্ধ। হাসপাতালের ৬০০ শয্যার মধ্যে এখন মাত্র ২৫০-৩০০ শয্যায় রোগী রয়েছে। হাসপাতালের আয় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে।'

রোগীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে শহরের কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালেও। ওই হাসপাতালের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (কলকাতা) অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হাসপাতালের ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেকের জন্য প্রোটেক্টিভ গিয়ার, বেতন, বিদ্যুতের বিলের খরচের টাকা ওঠানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের পেরেন্ট কোম্পানির থেকে কর্পোরেট সার্বসিডির প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোন খাতে কত টাকা দেওয়া হবে তা মূল মার্কিন সংস্থার উপর নির্ভর করছে।'

স্পেশ্যালিটি হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও খারাপ। আনন্দপুরের ফর্টিস মাল্টিস্পেশ্যালিটি এবং রাসবিহারী এভিন্যুর ফর্টিস হসপিটাল অ্যান্ড কিডনি ইনস্টিটিউটে রোগী ভর্তি আরও কম—২০ শতাংশের মতো। হাসপাতালের সিনিয়র ম্যানেজার-মার্কেটিং অরিজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, 'সাধারণত আমাদের হাসপাতালে মোট শয্যার ৮০ শতাংশে ভর্তি থাকে। বর্তমানে তা ১৮-২০ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, ২৪x৭ ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির কর্মীদের বাড়ি থেকে আনার ব্যবস্থা এবং কিছু ক্ষেত্রে তিন-চারদিন থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এর ফলে খরচ বাড়ছে।'

বেল ভিউ নার্সিংহোমেরও পেশেন্ট অকুপেন্সি রেট কমে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। হাসপাতালের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'অকুপেন্সি রেট ১৮-২০ শতাংশে কমে এসেছে। চিকিৎসা করাতে চাইলেও যানবাহন না পেলে রোগীরা আসবে কী করে?'

ইমামি গোষ্ঠীর হাসপাতাল আমরির সল্টলেক, মকুন্দপুর এবং ঢাকুরিয়া মিলিয়ে তিনটি শাখা রয়েছে। সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের রোগীদের ৮-১০ শতাংশ বাংলাদেশ থেকে আসে। তিনটি হাসপাতাল মিলিয়ে গড়ে ৮৫ শতাংশ শয্যা ভর্তি থাকে। এখন তা কমে ৩০-৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ কদিনে আয় কমেছে ৭৫-৮০ শতাংশে।'

রোগী কম আসায় হাসপাতালগুলির নগদ জোগানে টান দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, হাসপাতালগুলিকে পিপিই, মাস্ক ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হচ্ছে নগদে। আমরির আধিকারিকটি বলেন, 'নতুন ভেন্ডারদের থেকে নগদে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হচ্ছে। কর্পোরেট এবং স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে এমন রোগী এখন নেই বললেই চলে।'

পিয়ারলেস হাসপাতালের চিফ এগজিকিউটিভ ডক্টর সুদীপ্ত মিত্রের কথায়, 'সাধারণ সময়ে আমাদের হাসপাতালের শয্যার ৯০ শতাংশেই ভর্তি থাকে। এখন তা ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ওপিডি খোলা হলেও সাধারণত যেখানে দৈনিক ৪০০ রোগী হয়, এখন সেখানে মাত্র ৪০জন রোগী আসছেন। ওপিডি এবং আইপিডি মিলিয়ে আয় ৬০ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছে। হাসপাতাল চালাতে এখন আমাদের দৈনিক ৬.৫-৭ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে।'

বাংলাদেশের রোগী বাবদ পিয়ারলেস হাসপাতালের যে ২০ শতাংশ আয় হয় তার পুরোটাই আপাতত বন্ধ। তার উপর হাসপাতালের ২৩০ জন কর্মীকে নিকটবর্তী হোটেলে রাখার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষকে। যার জন্য দৈনিক অতিরিক্ত ৪৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে।

লকডাউনের পরেও হাসপাতালকে এই ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ, কর্মীদের অনেকের পাড়ায়, বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, সুদীপ্ত জানান। তিনি বলেন, 'এই ক্ষতি সয়ে এক-দু'মাস চালানো যেতে পারে, তারপর পরিস্থিতি কী হবে তা এখনই বলা যায় না।'